দাওয়াহ সংস্করণ

উল্টো সিদ্ধান্ত

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

শারঈ সম্পাদকের কথা / ৭
আমি-কথন / ৮
ছোট্ট একটা কাজ / ১১
স্পর্শের ভ্রান্তি / ১৪
উল্টো নির্ণয় / ১৬
সত্য / ২৬
সত্যের ব্যাপারে সত্য / ২৮
আত্মঘাতী কথাবার্তা / ৩১
সত্যকে জানা সম্ভব? / ৩৪
হিউমের ভুল / ৩৭
আমি কে? আমি এখানে কেন? / ৪০
ডিজাইন কি আদর্শ আর নিখুঁত হতেই হবে? / ৪৫
নানান রূপের ইভোলিউশান!/ ৪৭
প্রিয় লেজ / ৫৪
বুদ্ধিমান সত্তা/ ৬০
ইজাজুল কুরআন/ ৬৫
ঘোষণা কর শ্রেষ্ঠত্বের / ৮৮
সূরা রুমের অলৌকিকত্ব / ৯৩
ভালোবাসা/ ৯৫
থইথই ভালোবাসায় জাগব বলে/ ৯৯
বার্তাবাহকের মর্যাদা /১০৩
আমি ভণ্ড নই তো?/ ১০৯
টানটান থ্রিলারের অংশবিশেষ/ ১১৬
এলার্ম! এলার্ম!!/ ১১৯
ফজরের সালাত চ্যালেঞ্জ/ ১২২
আপনি ফিরবেন বলে / ১২৫
মধ্যবিত্ত পাথর পিতা/ ১২৮
সূরা কাহাফের এক কণা/ ১৩১
সাফল্য/ ১৩৪
হৃদয়ের অবাধ্যতা/ ১৩৭
আমরাও কি সেই পথেই হাঁটছি?/ ১৪২
সুন্নাত / ১৪৬
লোকপূজা / ১৪৮
দাসের কথা / ১৫০
বোতল / ১৫৩
ভাই / ১৫৫
বদলানোর রমাদান / ১৫৭
রমাদানের শেষাংশ / ১৬১
প্রিয় মানুষগুলো / ১৬৬
খেজুরের বাগানটা / ১৬৯
দড়ি / ১৭২
উপহার / ১৭৪
গোশতের দাওয়াত / ১৭৬
একজন চেনা শিক্ষকের অচেনা কথা / ১৭৮
বুঝে কথা বলা / ১৮১
সেই কুখ্যাত চ্যালেঞ্জ / ১৮২
নিজেকে বলি / ১৮৪
কবে শিখবে ভালোবাসতে? / ১৮৫
চাকরি আর আপনার আপস / ১৮৭
আপনার দুর্বলতা / ১৯০
জীবন্ত মিরাকেল / ১৯২

ভালোবাসা আর হিদায়াত / ১৯৬
নক্ষত্রকথন / ২০০
মুসিবত / ২০৩
নিয়ামাত / ২০৫
কিছু কষ্ট-কথা / ২০৭
জ্ঞান : কী করব? / ২১১
একটা কনফেশান / ২১৪
নতুন জন্ম মুহূর্তেই / ২১৯
একটু ভাবুন / ২২১
আবারও স্মরণিকা / ২২৪
সত্যিটা বলুন না! / ২২৬
স্পিরিট আর রিচুয়াল / ২৩০
আর অপমান না / ২৩৩
টর্চার! / ২৩৫
পরীক্ষা আর পরীক্ষা / ২৩৮
বই-রাগী / ২৪০
নন-প্র্যাক্টিসিং / ২৪৪
রিযকের ভয় / ২৪৬
হাল ছাড়বে? / ২৪৯
মশাল নিয়ে শেষকথা / ২৫৬

শায়খ সম্পাদকের কথা

সব প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য। দরুদ ও সালাম নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর। আমার সন্তান আমাকে তার শিক্ষক তোয়াহা স্যার এর একটি পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলল, "আব্বু, স্যার আপনাকে তাঁর এই পাণ্ডুলিপিটা দেখে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন।" সন্তানের কথার ভালোবাসায় শুরু করলাম পড়া। আল্লাহর রহমতে ওই সময়ে বেশ অবসরও ছিল। গভীর আগ্রহে মনযোগ-সহকারে পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ার পর মনে হলো, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিসের মু'জিজা লেখকের কলম দিয়ে ভেসে উঠেছে। লেখক সত্যের অনুসন্ধানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণে দিগ্‌বিদিক ছুটাছুটি করতে গিয়ে কুরআনের আলোকে তাওহীদের পথের সন্ধান পেয়েছেন।

> "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তির চাইতে বেশি খুশি হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন-প্রান্তর অতিক্রম কালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় তার (বাহনটির) পিঠের উপর থাকে।
>
> অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পরে। ইতোমধ্যে বাহনটি তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশির চোটে বলে উঠে, "হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস আমি তোমার প্রভু!"
>
> সীমাহীন খুশির কারণে সে ভুল করে ফেলে।" (সহীহ মুসলিম)

সত্যর সন্ধানে লেখকও উক্ত বাস্তবতার শিকার। স্রষ্টার ব্যাপারে সত্যতা অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর পরিশ্রম আল্লাহ কবুল করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি তাঁর বইটি বাস্তবতা দিয়ে ইসলামকে যুগোপযুগী করে সুন্দরভাবে নানারকম দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছুই আমার জ্ঞান অনুযায়ী দৃষ্টিগোচর হয়নি। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের জন্য সত্যপ্রাপ্তির উপায় হোক। আমীন।

-শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দিন খাকী

১১ জুন, ২০১৭

আমি-কথন

বইটি একাডেমিক না। আপনাকে বলা নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি বলা যায়। সত্য খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া, সত্যের ঠিকানা পেয়ে সেই খোঁজে হাঁটার গল্পই বইটি।

আমি অন্ধকারের মানুষ। হঠাৎ যেদিন আবিষ্কার করলাম—আমার পুরোটা জীবন নর্দমার নোংরায় মাখানো, গর্তের গহীনে হাঁচোড়-পাঁচোড়-করে-কাটানো, যখন বুঝলাম 'আমি' আসলে এই শরীরটা নই; বরং এই শরীর নামক বাহনটার এক আধ্যাত্মিক চালক, তখন মনে হলো—এই উপভোগের সংকীর্ণ জীবনযাপনটা সত্যিকারের 'আমার' উদ্দেশ্য হতে পারে না।

একসময় হাঁটতে হাঁটতে আলোর কথা জানলাম। অন্ধকার গর্তের এই সুড়ঙ্গপথের কোথাও সত্যের মিষ্টি ঝরনাধারার উপস্থিতি অনুভব করলাম। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। ততদিনে আত্মাকে অর্থাৎ, আমার আসল সত্তাটাকে নিজের অতীত জীবনযাপন দিয়ে মেরে মোটামুটি খুনই করে ফেলেছি। দুর্বল মৃতপ্রায়-আত্মা দিয়ে শরীর আর কতটুকুই-বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়? দাঁড়াতে পারি না। হাঁটতে গেলেই পড়ে যাই। হাত পা ছিলে যায়। নোংরা সামাজিক সুড়ঙ্গপথের রীতিনীতি আর প্রবৃত্তির-শেকলে-ছেয়ে-থাকা কুৎসিত অন্ধকার আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার। পড়ে ফেটে-যাওয়া মাথা নিয়ে কতবার হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি! কেন যেন আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে হাঁটতে চেয়েছি। আলোতে যে আমি ভেসে যেতে চাই। ওই ঝরনার সুপেয় ধারাতে আমার গায়ের সব নোংরা যে ধুতে হবে, অথৈ তৃষ্ণা যে মেটাতেই হবে আমার! তার আগে যে আমি থামতে চাই না। চাই না আপনিও থেমে যান। তাই নিজেকে কথাগুলো বলেছি। সাথে আপনাকেও।

প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্করণ কেন?

কারণ, প্রথম সংস্করণে দুটো বড়ো গলদ ছিল।

প্রথম গলদ হচ্ছে, অতিমাত্রায় বানান ভুল। নানান চেষ্টা তদবীর করেও পাঠযোগ্য, কম ভুল বানানের একটা মুদ্রণও পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারিনি, এরচেয়ে লজ্জার আর বিব্রতকর পরিস্থিতি একজন লেখকের জন্য কীই-বা হতে পারে! স্যরি বলা বা ক্ষমা চাওয়া সমাধান নয়, তবুও চেয়েছি, চাচ্ছি, চাইব। পাঠকের হক নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা

বইটা পড়েছেন, আমাকে বুকে টেনে নিয়েছেন, লিখে মনের কথা জানিয়ে স্নেহ, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়েছেন, তা একমাত্র পরম করুণাময়ের স্নিগ্ধ দয়া আর রহমত ছাড়া কিছুই না। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর এরই মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের মানুষগুলোর চরম উদার মন আর বিশাল হৃদয়ের দুয়ারগুলো আমি দেখে ফেলেছি।

আপনাদের অকৃত্রিম পাঠ-অনুভূতি, ভালোবাসা, স্নেহ আর দুআ-মাখানো-পাঠ-প্রতিক্রিয়াগুলো আমাকে যে কী তীব্র অনুপ্রেরণা দিয়েছে, কতবার যে আবেগে চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে, হিসেব নেই। একজন লেখকের জন্য দুনিয়ার বুকে সবচাইতে বড়ো উপহার বোধ হয় পাঠকের কাছ থেকে বিশাল বিশাল পাঠ-অনুভূতি পড়তে পারা। করুণাময়ের দয়ায় লেখকের জন্য এ এক মহাসৌভাগ্য! আলহামদু লিল্লাহ, উল্টো নির্ণয় পড়ে অনেকেই বিশাল বিশাল পাঠ-অনুভূতি উপহার পাঠিয়েছেন, দুআতে অধমকে মনে রেখেছেন, এজন্য আমি যে কী পরিমাণ আবেগে আপ্লুত আর কৃতজ্ঞ, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। নিচে দেওয়া ইমেইল আইডিতে ভবিষ্যতেও আপনাদের পাঠ-অনুভূতি পাওয়ার অপেক্ষায় থাকব।

দ্বিতীয় গলদ ছিল ইজাজুল কুরআন অধ্যায়টা। আল-কুরআনে বিশেষ কিছু শব্দ-সংখ্যার-মিল-পাওয়া-বিষয়ক মূল অংশটাতে ভালো রকমের কিছু তথ্যবিভ্রাট ছিল, যা পাঠকরা জানানোর পর আরও পড়াশোনা আর ঘাঁটাঘাঁটি করে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আলহামদু লিল্লাহ। রাব্বে কারীম যেন আমার ভুলগুলো পুরোপুরি মাফ দিয়ে আমাকে আর পাঠকদেরকে কবুল করে নেন। আমীন।

প্রথম সংস্করণের প্রকাশক রিজওয়ান ভাই আর প্রচ্ছদ ডিজাইনার মাসুম ভাইয়ের আন্তরিকতা, চেষ্টা, নিষ্ঠা আর ভালোবাসা না থাকলে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে উল্টো নির্ণয় পৌঁছে দেওয়াটা হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত। ভাইদের পরিশ্রম আর আন্তরিকতা যেন আল্লাহ কবুল করে নেন, বিনিময়ে আমাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়ে যেন উনার রাহমাতের চাদরে সবাইকে পরম মমতায় জড়িয়ে নেন, বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে পাশাপাশি রাখেন। আমীন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বর্তমান প্রকাশক রোকন ভাই বানান-প্রমাদসমূহ ঠিক করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বাল্যবন্ধু ভ্রাতৃসম হাসান মাহমুদ পরম যত্ন আর মমতা নিয়ে অসাধারণ একটা প্রচ্ছদ উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন। আর আমি ইজাজুল কুরআন অধ্যায়টা নতুন করে লিখে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেন সবাই আগের চেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়ে আরও বেশি উপকৃত হতে পারে। কুরআনকে তীব্রভাবে ভালোবেসে আল্লাহকে চাইতে পারে। আল্লাহ তাওফীক দিন।

কখনও ভাবিনি—নিজের বইয়ের ভূমিকা লেখার সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হবে। আমার আজকের অবস্থান, শিক্ষা, পথচলার অনুপ্রেরণার পেছনে আছে আমার

শ্রদ্ধেয় আব্বু-আম্মুর সুগভীর ধৈর্য আর সহনশীলতা। অগাধ ভালোবাসা আর আদর। তীব্র ক্ষমাশীলতার টলটলে হ্রদ। তাদের সাথে এত অন্যায় আর অবিরাম সব জঘন্য ভুলত্রুটির পরেও এই দুজন মানুষ আমাকে সব সময় আদর-আশ্রয় দিয়েছেন, ক্ষমা করে বারবার ভালোবেসেছেন, সহ্য করেছেন সব কষ্ট ভুলে। বুকে টেনে নিয়েছেন প্রতিটি বার। জানি না, কীভাবে এই মানুষ দুটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা প্রকাশ করব! তাদের প্রতি আমার মতো সুতীব্র অনুভূতিকে আসলে অক্ষরে বাঁধা যাবে না। সম্ভব না।

আমার ছোটো দুটি ভাইয়ের অবিরাম সঙ্গ আর সাপোর্ট না থাকলে আমি বোধহয় অপূর্ণই থেকে যেতাম। আমার জীবনের ভুলভালগুলো ওরা এত যত্ন করে বুঝিয়ে বলে, আর ঠিক কাজগুলোতে এত বেশি উৎসাহ দিয়ে আমাকে সামনে এগিয়ে দেয় যে, নির্দ্বিধায় বলতেই হয়—ওরা শুধু আমার ভাই-ই না, পরম বন্ধুও। এই দুষ্টু দুটি ভাইয়ের জন্যে যে গভীর স্নিগ্ধ স্নেহ আর আদর আমার বুকে কলকল করে বয়ে যায়—তা কীভাবে কীভাবে যেন ওরা ঠিকই বুঝে ফেলে! আত্মার সত্যিকার বন্ধন বোধ হয় এমনই হয়।

আমার জীবনসাথি আর কন্যাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে আমার জন্যে। তারা সেটা হাসিমুখে সয়েছেন তো বটেই, উল্টো বারবার উৎসাহ দিয়ে গেছেন আমার প্রতিটি ভালো ইচ্ছে-কাজে, এই বইটির সূচনাতে। নিজেদের প্রচণ্ডরকম কষ্টগুলো লুকিয়ে, স্মিত হাসিমুখে, কুৎসিত সমাজের প্রতিটা নোংরামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে। এই মানুষগুলোর প্রতি যতই কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসার কথা বলি না কেন—তা সব সময় অপ্রতুলই রয়ে যাবে। যথেষ্ট হবে না। কক্ষনও না।

অবিরাম রহমত বর্ষিত হোক প্রাণের প্রিয় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর। পরম ক্ষমাশীল দয়াময় আমাকে, আমার কাজের ভুল-ত্রুটিগুলো, আমার চারপাশের মানুষগুলো এবং পাঠকদেরসহ সবাইকে ক্ষমা করে কবুল করে নিন। রাব্বুল আলামীন যেন পাঠক-পাঠিকাসহ বইয়ের সাথে জড়িত প্রতিটা মানুষের গুনাহগুলো মাফ করে দিয়ে, পুরোপুরি পবিত্র করে নিয়ে, জান্নাতুল ফিরদাউস দিয়ে দিন বিনা হিসাবে। সবাইকে তিনি—সত্যকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করার হিম্মত দিন, শক্তি দিন। দুঃসাহস দিন সত্যকে মেনে নিয়ে সব বাধা-বিপত্তির বিপরীতে দৃঢ় পায়ে পথ চলতে। সবাইকে।

মিথ্যা আর বানোয়াট ভিত্তিহীন এই নোংরা সামাজিক জীবনের ইন্দ্রজালটা ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার ইচ্ছের অনির্বাণ মশালটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠুক প্রতিটি প্রাণে।

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর
touahaakbar@gmail.com

ছোট্ট একটা কাজ

আজকের এই অসাধারণ গল্পটার দাম ১৫ টাকা।

এটা একটা সাধারণ মানুষের ভেতরে বেড়ে-ওঠা অসাধারণ শুভ্রতার গল্প।

আনন্দের গল্প।

চারিদিকে এত অশান্তি আর অন্যায়ের মধ্যে এই ঘটনাগুলো মনে করে করেই আমি এখনও স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন বুনি। এই ঘটনাগুলো আছে বলেই তো এখনও রাতে ঘুমোতে পারি।

তো, ঘটনাটা বলি।

সেইদিন ভার্সিটির প্রশাসন-ভবনে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে গিয়েছিলাম।

বায়লোজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে ১৫ টাকায় রিকশা ভাড়া ঠিক করে যখন প্রশাসন-ভবনের সামনে পৌঁছালাম, তখন সারা মানিব্যাগ উলট-পালট করে হাতিয়ে দেখে মাথায় হাত।

- ইন্নালিল্লাহ ভাইয়া, আমার কাছে দেখি ৫০০ টাকার নোট।

- খাইছে!

তাঁর করুণ চেহারা দেখে চরম দিশেহারা লাগছিল। বললাম,

- দাঁড়ান, খুঁজে দেখি ভাংতি পাই কি না!

প্রশাসন-ভবনটা এমন এক বিরান জায়গায় যেখানে আশেপাশে একটা দোকানও নেই। একটাও না। এখানে রিকশাও দাঁড়ায় না খুব একটা। স্টুডেন্টদের চলাফেরাও হাতেগোনা। তারপরেও কয়েকটা পথচলতি-স্টুডেন্টকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, 'ভাইয়া, ভাংতি হবে?'

ভাংতি না থাকায় যে মানুষের মনে এত বিশাল আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে পারে, তা তাদের সারিসারি সাজানো ঝকঝকে সাদা দাঁতের উজ্জ্বল হাসি না দেখলে কোনোদিনও

জানা হতো না! যাকেই জিজ্ঞেস করি দেখি তিনি ভাংতি না থাকায় চরম আনন্দিত। এদিকে তার আনন্দের গুরগুরানি দেখে আমার কণ্ঠস্বর করুণ থেকে করুণতর হতে লাগল, রিকশাওয়ালা ভাইয়া আরও চুপসে যেতে লাগলেন। এ কী মহা বিপদে পড়া গেলরে ভাই!

আস্তে আস্তে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি সেই ছোটোবেলা থেকেই হাবাগোবা টাইপের। কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতায় এত্ত বেশি রাগ এর আগে কখনও হয়নি।

হঠাৎ একজন এগিয়ে এসে বললেন,

- ভাইয়া, রিকশা ভাড়া কত?

- ১৫ টাকা।

তিনি ১৫ টাকা বের করে রিকশাওয়ালা ভাইয়াকে দিয়ে দিলেন। আমি বললাম,

-আপনি কেন দিচ্ছেন? আমার তো ভাংতি দরকার। ১৫ টাকা না।

- কিচ্ছু হবে না। ভাংতি নাই বলে কি তার ভাড়াও দেওয়া হবে না নাকি? হেহেহে!

আমার হাসি আসলো না। চিমসে মুখ বানানোর চেষ্টা করে চিঁ-চিঁ করে জিজ্ঞেস করলাম,

- কিন্তু, আপনাকে এখন আমি ১৫ টাকা কীভাবে দেব?

- দিতে হবে না ভাইয়া। ১৫ টাকাই তো। কিচ্ছু হবে না। হেহেহে!

এই বলে তিনি হাঁটা দিলেন।

আমি ডাকলাম না।

থ্যাংস দিলাম না।

নাম জিজ্ঞেস করলাম না।

কোন ডিপার্টমেন্টে পড়েন, কই থাকেন জিজ্ঞেস করলাম না।

কিচ্ছু না।

জাস্ট হাবার মতো ৫০০ টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, মানুষ এত ভালো? এত্ত? অন্যের বিপদে মানুষ নিজ থেকে আগায়ে এসে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে এখনও হেল্প করে এইভাবে? আমি হলে কি এমন করতাম?

জানি না।

তবে ভবিষ্যতে যে এইভাবে এগিয়ে গিয়ে মানুষকে নিজ থেকে সাহায্য করব এইটুকু বুকের ভেতরে নিশ্চিত জানি।

১০ টাকা আর ৫ টাকার নোট দুটো। কত ছোট্ট! কত ক্ষুদ্র!

কিন্তু সেটা দিয়ে সাহায্য করতে আসার পেছনের মনটা কত বিশাল বড়ো, তাই না? যেন আকাশছোঁয়া।

মাত্র ১৫ টা টাকা।

অথচ একজন হাবাগোবা মানুষের ভেতরটা সারা জীবনের জন্যে আমূল বদলে দিয়ে গেল।

আপনি কখনোই জানবেন না, আপনার একটা ছোট্ট কাজ দেখেও হয়তো অন্য-আরেকটা মানুষের পুরো জীবনটাই বদলে যাবে। আপনি মুসলিম বলেই হয়তো আপনার সেই কাজে মুগ্ধ হয়ে সে ইসলামকে জানা শুরু করবে। পথ খুঁজে পাবে।

তাই একটা ছোট্ট কাজকেও যেন আর অবহেলা করবার দুঃসাহস না করি।

স্পর্শের ভ্রান্তি

খুব অবাক লাগে!

সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোও যখন অসীম মমতা নিয়ে কপালে হাত রাখেন, তখন কী যে ভালো লাগে! স্পর্শ, ছুঁয়ে দেওয়ার মধ্যেই এই অদ্ভুত ম্যাজিকটা লুকোনো। কাউকে ছুঁয়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে আমি এখন তার সবচাইতে কাছে আছি। এই কাছে থাকার উৎসটা হলো ভালোবাসা। ছুঁয়ে দেওয়ার ফলে একটা ভালোলাগা অনুভূত হয় ভেতরে। জ্বর এলে আব্বু-আম্মু যখন পরম আদরে কপালে হাত দিয়ে দেখেন তখন এই ভালো লাগা বিদ্যুতের মতো সবার ভেতরে বয়ে যায়। প্রিয় মানুষটা আর আমার মাঝখানে সামান্যতম ফাঁকা জায়গাও নেই, একটুও না, এই সত্যটা আমাদের অবচেতন মনের ক্যানভাসটাতে আনন্দের আকাশী জলরঙে একটা হালকা টান দিয়ে যায়! মৃদু মৃদু ভালো লাগতে শুরু করে!

এই যে স্পর্শকে এত সত্য, এত জীবন্ত মনে হয়, সেই স্পর্শে কিন্তু কেউ আমাদের সত্যি সত্যি ছুঁয়ে দিতে পারে না। দুইজনের শরীরের লক্ষ লক্ষ এটমের বাইরের দিকে থাকা ইলেক্ট্রনগুলো পরস্পরকে তীব্র বিকর্ষণ করে ভেতরের দিকে চেপে যায়। একটা মানুষের ইলেক্ট্রন আরেকটা মানুষের ইলেক্ট্রনকে স্পর্শ করতে পারে না। ফলে, মাঝখানে ঠিকই একটা বি-শা-ল দূরত্ব থেকে যায়। হোক না তা ইলেক্ট্রনের সাপেক্ষে! এটাই সত্যি। শুধু আমরাই জানি না, বুঝি না এই দুরত্বের সত্যকে। আমরা বুঝে উঠতেই পারি না কখনও যে, দুনিয়াটা আসলেই একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তির জায়গা। গভীর ভ্রান্তি!

আমরা না জানলেও কিন্তু এটাই সত্যি। আমাদের জানা বা অজানা থাকার ফলে কিন্তু সত্যটা বদলে মিথ্যে হয়ে যায় না। সত্যের জায়গায় সত্য অবিরাম অটল থাকে। আমরাই কেবল আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের গণ্ডিতে তাকে ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না। আমরা যে সত্যি সত্যি কত্ত অসহায় সেটা অনুধাবন করার মতো জ্ঞান আর ক্ষমতাও আমরা রাখি না। হ্যাঁ, আমরা এতটাই অসহায়!

যিনি সব সত্যকে ধারণ করে আছেন, সব সত্যি সত্যি যেমন আছে তেমন হয়ে থাকার

আসল কারণ আর আদি উৎস যিনি, আমাদের জন্যে তাঁর রয়েছে তীব্র মায়া আর স্নেহ! জগতের অকুলপাথারে তাই আমাদের জন্যে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় কিছু সত্য তিনি তাঁর কথামালায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথামালায় একটা কথা[১] জানতে পেরে বুকটা অদ্ভুত শূন্য হয়ে গেল। তীব্র হাহাকার আর শূন্যতায় বুকের আকাশটা হঠাৎ করেই পুরোপুরি খালি হয়ে গেল। দুনিয়াটা ভ্রান্তি, মায়া ছাড়া আর কিচ্ছু না। যা অনুভব করছি, উপভোগ করছি, সবই আসলে ভ্রান্তি! এটাই সত্য! এটাই রিয়েলিটি, বাস্তবতা। যেমনটা হয় ছুঁয়ে দেওয়ার সময়। ছুঁয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের মনে হতে থাকে যে আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, অথচ এই মনে হওয়াটা কেবলই আমাদের শরীরে কিছু ইলেক্ট্রিক সিগন্যাল আর কেমিক্যাল রিয়েকশানের ফলাফল। কী অদ্ভুত আর অভূতপূর্ব ডিজাইন করেই-না আমাদের এই পরীক্ষার হলে পাঠানো হয়েছে! সত্যিই অসাধারণ!

জানি, আমি এইখানে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। পরীক্ষা দিতে বসেছি। তবু পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে কঠিন কঠিন সব আনকমন প্রশ্ন দেখে মনটা উদাস হয়ে যায়। গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন সব সৃজনশীল প্রশ্ন দেখে ভয় আর উৎকণ্ঠায় মন আঁধারে আঁধারে ঘিরে আসে। যদিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আমরা বুকের ভেতরে ভয় পেলেও বিশ্বাসীদের জন্যে সত্যি সত্যিই ভয়ের কিছু ঘটবে না। তবুও ভয় কাটে না। ভয় যে কাটবে না এটা তিনিও জানেন। তবুও তিনি আমাদের আশ্বস্ত করতে ভুলেননি।

আমার পরীক্ষার শেষ সময় কবে জানি না। পরীক্ষা শেষ করে খাতা জমা দিয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে এক দৌঁড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। আবার এদিকে কিছুই যে ঠিকঠাকমতো লিখতে পারিনি, যা লিখেছি তাও সবই ভুলেভালে ভরা সেটাও জানি। চারপাশের পরীক্ষা নামক দায়িত্বগুলোর তীব্র চাপ, সেই সাথে অতীতের পৃষ্ঠায় ভুল উত্তর লিখে আসার কারণে এই পৃষ্ঠার অঙ্কটার উত্তর না মেলা! প্রতিটা ক্ষণ যে কী ভয়াবহ! কী যে ভয়ংকর!

এই ভয়ংকর জায়গা থেকে হয় আরও নিচে আরও অকল্পনীয় ভয়ংকরে অনন্তের জন্যে তলিয়ে যাওয়া, আর নয়তো ধৈর্য রেখে দাঁতে দাঁত চেপে পরীক্ষা দিতে থাকলে উপরে উঠে যাওয়া। নিজের বাসায়। নিজের সত্যিকারের বাসায়, যেখান থেকে এইখানে আসার পরে কেবলই খারাপ লাগে দিবারাত্রি।

জানি না আরও কতদিন বাকি! শুধুই স্বপ্ন দেখি বাসায় ফিরে যাবার। নিজের বাসায়। আমাদের সত্যিকারের বাসা।

---

[১] আল-কুরআন, সূরা হাদীদ : ২০

উল্টো নির্ণয়

প্রিয় বন্ধুটা সেদিন বাসায় এসে বলছিল,

"তোর দেওয়া স্ট্যাটাসটা পড়লাম। আরে, যে আপুটার বদলে যাওয়ার গল্প লিখলি তার চেয়ে তোর বদলানোর গল্পটা তো আরও মজার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই বছরে তুই কী ছিলি, আর শেষ দুই বছরে কী হলি, সেটা শেয়ার কর।"

আমার লজ্জা লাগে বলতে। এ যে একান্তই নিজের-করা যুদ্ধের কথা। একা একা ভুল পথে, ভুল গলিতে হন্যে হয়ে হোঁচট খাওয়া আর হেঁটে বেড়ানোর গল্পের কথা বলতে কার ভালো লাগে? ভুল আর নষ্ট অতীত ছুড়ে ফেলে দিয়েছি, তাকে কেন আবার খুঁড়ে বের করে দুর্গন্ধ করা চারিপাশ? পরে ভাবলাম, এই অতীতই তো আমার শক্তি, আমার এগিয়ে চলার সাহস আর প্রেরণা। কেউ যদি একটুও সাহস পায় এই গল্প থেকে, কেউ যদি সত্যের পথে, সত্যের জন্যে আপসহীন হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়ে যায়? বলা তো যায় না।

গাপুসগুপুস করে আমি বই খেতাম সেই ছোট্টবেলা থেকে। সবাই খেলা দেখত, আমি বই খেতাম। বন্ধুরা আড্ডা দিত, আমি বই পান করতাম। বন্ধুরা টিভিতে বুঁদ হয়ে থাকত, আমি বইয়ে ডুবে হাঁসফাঁস করতাম। বই ছিল আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। প্রিয় খাবার, পানীয়, বালিশ, জগৎ—সবই ছিল আমার বইময়। এমন কোনো বই ছিল না যা আমি পড়তাম না। ইন্টার পাশ করার পর হুমায়ুন আজাদের "আমার অবিশ্বাস" বইটি গেলার পর পেটে খুব গ্যাস ফর্ম করে। খুব পানি খেয়ে, রেস্ট নিয়ে পেটের গ্যাস দূর হলো, কিন্তু মাথায় ঠিক ঠিক গ্যাস্ট্রিক হয়ে গেল।

স্রষ্টা কি সত্যিই আছেন? নাকি সব মানুষের বানানো গালগপ্পো? হুম্ম? ধর্মটর্ম কি আসলে বানানো কিছু হাস্যকর "রিচুয়ালস" না? সমাজের গড়ে তোলা সংস্কারভীতু মন বলে ওঠে—"না না, বাদ দাও তো ওসব ফালতু কথা। ওসব ভাবতে নেই।"

যুক্তি বলে, "না না তো করছ, ভিত্তি আছে এই বিশ্বাসের? ভীরু কাপুরুষ কোথাকার!"

মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। কী করা যায়? কী করা যায়? পারি তো খালি একটাই কাজ—

পড়া। তো, শুরু হয়ে গেল আরকি!

পড়তে পড়তে আরজ আলী মাতুব্বর থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল, কুরআনের অনুবাদ থেকে শুরু করে বেদ-গীতা-বাইবেল কিচ্ছু বাদ থাকল না। একটাই লক্ষ্য : যেটা সত্যি সেটাকে খুঁজে বের করব, শুধু সেটাই মানব। সত্যের সাথে কোনো আপস চলবে না, চলতে পারে না। ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ পড়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তা হলে এতদিন সব ফালতু বিশ্বাস মেনে এসেছি? হায় হায়! বন্ধ করো এসব। কেন মিলাদ পড়ো? নামাজ কেন পড়ো? মাজারে যাও কেন? মুসলিমই যদি হও তা হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেন পড়ো না? নিজেকে মুসলিম বলো কী বুঝে? দেব-দেবীর পূজা করছ ভালো কথা, জেনেবুঝে করছ তো? ঘরে-বাইরে, বন্ধু-সহপাঠী, ঈদ-পূজায় সবখানে সবাইকে জ্বালিয়ে মারতাম। কেউ কিচ্ছু জানত না। উত্তর দিতে পারত না কেউ। সব্বাই হই-হই করে উঠত : "মাইরালামু-কাইট্টালামু" সরগোল তুলে। সার্টিফিকেটধারী বেকুবের দলকে চিনে গেলাম, চিনে গেলাম হাস্যকর জ্ঞানার্জনের সিস্টেমটাকে আর সেই সিস্টেম থেকে বিজবিজ করতে করতে বেরিয়ে আসা অন্ধ মেরুদণ্ডহীনদের। অন্ধ বিশ্বাস আর বিনোদনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আবিষ্কার করে অনেকদিন অ-নে-কদিন হতাশায় ভুগেছি, আর তামাক পুড়ে ছাই করেছি।

হতাশা ধীরে ধীরে ঘৃণাতে আর ঘৃণা থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠল অহংকার। খুব পড়তাম, আর সবাইকে যেখানেই পেতাম ধুয়ে দিতাম। এক্কেবারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ডলে, এসিড দিয়ে ঝলসে বিবর্ণ-রংহীন বানিয়ে ছেড়ে দিতাম। ভার্সিটির স্টুডেন্ট হলে তো কথাই নেই। চূড়ান্ত ওয়াশ দিতাম। মিয়া ভার্সিটিতে পড়ো! নামাজ পড়ো, পূজা করো, কেন করছ, কী করছ না বুঝেই করবা, চলবা আর সমাজে গিয়া ভাব নিবা যে "খুব শিক্ষিত হইছি গো" তা হবে না। অসহ্য লাগত এই সমাজব্যবস্থা আর মানুষের অবিরাম ভণ্ডামি। এখনও লাগে।

এভাবে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষাও পার হয়ে গেল। পড়া কিন্তু থামেনি। সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশান। ধুমিয়ে চলছে ডকুমেন্টারি দেখা। এর মধ্যেই একদিন Atheism and Theism নিয়ে এক লেকচার দেখা হয়ে গেল। খ্রিস্টান প্রফেসর এত এত সুন্দর করে লজিক দিয়ে সবকিছু বোঝালেন যে নড়েচড়ে বসলাম। ভাবনার নিস্তরঙ্গ পুকুরে অনেকদিন পরে তীব্র ঢিলের আঘাত! এইবার Theism এর লজিকের পিছে লাগলাম নিরপেক্ষ মন নিয়েই। এর সাথে একাডেমিক স্টাডি হেল্প করছিল বিবর্তনবাদ নিয়ে ভুল ধারণাগুলোর দরজায় আঘাত করতে। সংশয়বাদী মন বারবার বলে উঠতে চাইল, স্রষ্টা কি সত্যিই আছেন তা হলে? আর অহংকারী মন বারবার তার টুঁটি চেপে ধরছিল।

কী যে কষ্ট এই নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা! কী যে যন্ত্রণা এই একা একা মানসিক যুদ্ধ করতে থাকা! এত্ত এত্ত অসহায় লাগা সেই অনুভূতি আর দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাওয়া। কেউ পাশে নেই। কেউ না। বারবার শুধু অহংকারী মন "ধর্ম ভুল, স্রষ্টা ভুল" বলে চিৎকার করে ওঠে আর বলে, "শোনো, তুমি যা জানো তাই ঠিক। আরও ভালো করে Atheism নিয়ে স্টাডি করো, করতেই থাকো। এইসব সংস্কার, ফালতু সংস্কার।" দিনরাত মাথায় খালি আর্গুমেন্ট আর কাউন্টার আর্গুমেন্ট ঘুরত। স্রষ্টা যে নেই সেটাই বা কনফার্ম করি কী দিয়ে? বিজ্ঞানীরা কী বলেন? ম্যাক্রো-ইভোলিউশানিস্টরা তো এই ব্যাপারে কিছু অপ্রমাণিত ধারণা কপচিয়ে উচ্ছৃংখলদের উস্কে দেয়। অথচ এই থিয়োরিগুলো থিয়োরিই শুধু। হাতে কলমে কাজ করে, অবজার্ভেশানে রেখে রেজাল্ট পাওয়ার জায়গা এটা নয়। বাকি থাকল দর্শন। শুধু ভাবনা দিয়ে, চিন্তা-পরীক্ষা (থট এক্সপেরিমেন্ট) করে যে কত্ত অসাধারণ জিনিস বের হয়ে আসে তা সবাই জানে। আর বিজ্ঞানের শুরুটাও তো সেই দর্শন থেকেই। শুরু হলো দর্শন-যুদ্ধ।

পড়তে পড়তে একটা উপলব্ধির শুরু হলো। আমি আসলে কিছুই জানি না, কিচ্ছু না। অহংকারের পাহাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। দর্শন, যুক্তি আর কমনসেন্সের যুদ্ধে নাস্তিক্যবাদ হার মানল। আমরা কোনোকিছু দেখে, ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে, বারবার দেখে তারপর একটা সিদ্ধান্তে যখন আসি তখন সেটাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বলি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কমনসেন্স আর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই কাজে লাগাই।

ধরুন, আপনাকে আমার এন্ড্রয়েড ফোনটা দেখালাম। তারপর বললাম আমার এন্ড্রয়েডটা সৌদি আরবের মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছি। এত বালি আর তেল এত্ত এত্ত মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে ঝড়ো হাওয়া আর জলে, তাপে আর শৈত্যে, তারপরে বজ্রের ধমধমাধম আঘাতে প্রথমে ধীরে ধীরে সিলিকন আর প্লাস্টিক, তারপর আরও মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে অন্যান্য পার্টস, ব্যাটারি ইত্যাদিতে বিবর্তিত হতে হতে হতে হতে আজকের এই টাচস্ক্রিনড এন্ড্রয়েড ফোনে বিবর্তিত হয়েছে। Samsung লেখাটা যে খোদাই করা দেখছেন, সেটাও এভাবেই এসেছে ভাই। বিশ্বাস করেন ভাই। আপনার দুটি পায়ে পড়ি ভাই, প্লিজ বিশ্বাস করেন। আপনি বিশ্বাস করবেন না। কেন? কেন করবেন না? কারণ, আপনার এতদিনের পর্যবেক্ষণ বলে এটা পুরোপুরিই অসম্ভব।

তাই?

একটা জড় পদার্থ থেকে আরেকটা জড় পদার্থ এভাবে তৈরি হওয়ার দাবিকে আপনি অসম্ভব বলছেন, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ চাইছেন আমার দাবির! ভালো ভালো, গুড, গুড! এই তো যুক্তিবাদী মন! যেখানে একটা জড় (তথা বালি, তেল ইত্যাদি) থেকে আরেকটা জড়ই (যেমন মোবাইল ফোন) তৈরি হতে পারে না, অসম্ভব, সেখানে জড় পদার্থ

থেকে একটা কোষের মতো অসাধারণ সাজানো-গোছানো আবার পুনঃউৎপাদনক্ষম জৈবিক একটা যন্ত্র নিজে নিজে এমনি এমনি তৈরি হতে পারে? সম্ভব? আপনি বুদ্ধিমান হলে অলরেডি দুইদিকে মাথা নেড়ে "না, না" বলছেন, আর অন্ধ-বিতার্কিক হলে উল্টো যুক্তি হাতড়ানো শুরু করেছেন।

প্রিয় অন্ধ-বিতার্কিক, আপনি আপনার অন্ধকূপে হাতড়াতে থাকুন যদ্দিন সুখ পান, ভাব নিয়ে নিজে যা জানেন তাকেই শুধু সত্য বলে মেনে যান গলার জোরে আর অহংবোধে, নিজের গোলকধাঁধায়। ততক্ষণে আমরা আরেকটু আলোকিত হয়ে নিই, কেমন?

যেহেতু এত্ত সূক্ষ্ম জটিলতায় পরিপূর্ণ একটা জিনিস এভাবে নিজে নিজে তৈরি হয়ে যেতে পারে না, অনস্তিত্ব থেকে নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসতে পারে না, তার মানে আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা যিনি কোনোকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন। এই দুনিয়া, প্রাণজগতের মধ্যে এত্ত সুন্দর নিয়ম-শৃংখলা আর ডিজাইন, নিখুঁত নিয়ম-কানুন মেনে চলা বিশাল মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে ছোট্ট ইলেক্ট্রন-প্রোটন সবকিছু একজন অসাধারণ অপার্থিব অতিবুদ্ধিমান, জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান ডিজাইনারের দিকেই ইশারা করছে অবিরাম।

কাজেই স্রষ্টা আছে, থাকতেই হবে।

আবার আরও একটু মন দিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় যে, একজনের বেশি স্রষ্টা থাকা অসম্ভব। দর্শন, যুক্তি আর নিরপেক্ষভাবে কমনসেন্স খাটালেই বোঝা যায় একজনের বেশি স্রষ্টা থাকলে এই এর সুন্দর শৃংখলা আর সাজানো-গুছানো প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনগুলো থাকত না, এলোমেলো আর বিশৃংখলায় ভরে থাকত পুরো অণু-পরমাণু হতে সমগ্র মহাবিশ্ব। অনেকগুলো স্রষ্টার হিসেব বাদ দিই। শুধুমাত্র দুইজন সমান ক্ষমতাবান স্রষ্টা থাকলেই কিন্তু শক্তির প্রদর্শনী আর যুদ্ধ লেগে যেত। একজন ডানে বললে, আরেকজন বলত বামে। ফলে, শৃংখলা কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতো না। টেনিসবল তিনবার অভিকর্ষের কারণে নীচে পড়ত, তো পরের দুইবার উপরে উঠে যেত, পরক্ষণেই আবার ডানে কিংবা বামে ছুট দিত কিন্তু তা তো না! সব তো কী সুন্দর নিয়ম-কানুন আর শৃংখলা মেনে চলছে। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তা হলে একজনই। তিনি অপার্থিব। সৃষ্টি অর্থাৎ যা কিছু অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এসেছে এমনকিছুরই সাথে তাঁর কোনো মিল নেই, সৃষ্টির কোনো গুণাবলী হুবহু তাঁর মধ্যে নেই, থাকতে পারে না। সৃষ্টির উপাদান হতে তিনি পুরোপুরি আলাদা, ফলে এর বৈশিষ্ট্য হতেও। কারণ, যদি তিনি সৃষ্টির মতো গুণাবলীর ধারক হয়ে থাকেন তা হলে তাকেও সৃষ্ট হতে হবে, যা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁকে যে সৃষ্টি করবে তাকে আবার আরেকজন দ্বারা সৃষ্ট হতে

হবে, তাকে আবার আরেকজন দ্বারা, এভাবে চলতেই থাকবে অসীম পর্যন্ত। এর কোনো শেষ নেই।

সহজ করার জন্যে একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন, আপনি একজন ট্রাক ড্রাইভার। গাড়ির ইঞ্জিন রাস্তায় হঠাৎ বিগড়ে গেল। ঠেলে ঠেলেই আধা মাইল দূরের গ্যারেজে নিতে হবে। ধাক্কা দেওয়া দরকার। একজনকে ডাকলেন।

তিনি বললেন,

"অক্কে ভাইয়া। কুনো সমিস্যা নাই। আমি ধাক্কা দিমু, তবে যদি আমার আরেকজন বন্ধু রাজি হয় তারপর দিমু, নইলে না।"

তার বন্ধুকে বললেন ব্যাপারটা।

সেই বন্ধুও উত্তর দিল, "অক্কে ভাইয়া। সমিস্যা নাই কুনো। আমি ধাক্কা দিমু, তবে যদি আমার আরেকজন বন্ধু রাজি হয় তারপর দিমু, নইলে না।"

তার বন্ধুকেও খুঁজে বের করে অনুরোধ করলেন। সেও একই কথা জানাল। তার আরেকটা বন্ধু রাজি হলে তবেই তিনি ধাক্কা দিবেন।

এভাবে যদি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, বন্ধুর সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকবে অসীম পর্যন্ত। ধাক্কা আর দেওয়া হবে না। গাড়িও আর কোনোদিন আধমাইল দূরের গ্যারেজে যাবে না। ঠিক?

এভাবে স্রষ্টাও যদি আরেকজন স্রষ্টা দ্বারা, সেই স্রষ্টাও আরেকজন স্রষ্টা দ্বারা তৈরি হতে হয় তা হলে তা অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে। সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণ ডিজাইনের ছাপ খুঁজে পাওয়া দূরে থাকুক, কোনোকিছু সৃষ্টিই তো হবে না আর কখনও। কিন্তু সৃষ্টি যেহেতু আছে, তাতে স্রষ্টার অতিবুদ্ধিমত্তা আর প্রজ্ঞার ছাপও পাওয়া যায় বুদ্ধি খাটালেই, তার মানে স্রষ্টাও আছেন। তবে মনে রাখতে হবে, সেই স্রষ্টা যদি আমাদের এই জীবনে দেখা কোনোকিছুর মতোই না। কারণ, যদি কোনোকিছুর মতো হয় তা হলে তাকে সৃষ্টি হতে হবে আরেকটা স্রষ্টা দ্বারা, তাকে আবার আরেকজন দ্বারা, এভাবে অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে, ফলে আমরা আর কোনো সৃষ্টিই দেখব না। তাই না?

স্রষ্টা আছেন, তবে সেই স্রষ্টা আমাদের দেখা কোনোকিছুর না, কোনো সৃষ্টির মতো না। কোনো মূর্তির মতো না, ফুটবলের মতো না, আমাদের মতো হাত পা চোখওয়ালা না, মোটকথা আমরা যেভাবে ভাবতে পারি তিনি সেরকম নন। খেয়াল করলেই দেখব, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাইরে, সৃষ্টিজগতের বাইরে ভাবতেই পারি

না। কল্পনায় একটা নতুন ধরণের প্রাণী তৈরি করার চেষ্টা করতে পারেন। তা হলেই দেখবেন সেখানে আপনি শুধু আপনার পরিচিত জগৎ থেকেই নানান রকমের উপাদান নিয়ে প্রাণীটাকে সাজাচ্ছেন। কিন্তু একটু আগেই আমরা বুঝেছি যে, স্রষ্টা সৃষ্টিজগতের কোনো উপাদান দ্বারা তৈরি হতে পারেন না, ফলে সৃষ্টিজগতের উপাদানগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য হতেই তিনি পুরোপুরি স্বতন্ত্র। একই কারণে তাঁকে থাকতে হবে সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাঁকে হতে হবে অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, শাশ্বত, সর্বশক্তিমান এবং স্বনির্ভর।

অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান এবং সর্বশক্তিমান হওয়া ছাড়া এই সুবিশাল নিউক্লিয়ার শক্তি বিকিরণকারী নক্ষত্র, জটিল অণু-পরমাণু, আর ছোট্ট আণুবীক্ষণীক কোষ হতে সমগ্র মহাবিশ্বের এত সুন্দর নিয়ম-কানুন তৈরি করা সম্ভব নয়। তিনি স্বনির্ভর এবং কখনোই কারও মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। তিনি অনাদি (সময়ের উপর অনির্ভরশীল, পরম) ও স্বনির্ভর না হলে কার উপরে নির্ভর করবেন? তিনি কারও উপরে নির্ভর করলে সেই সত্তা আবার আরেকজনের উপরে নির্ভর করার প্রশ্ন চলে আসে, যা কিনা অবিরাম চলতেই থাকবে, ফলে মহাবিশ্বের কিছুই আর অস্তিত্বে আসতে পারবে না। একইভাবে তিনি Self-fulfilling না হলে তাকে কে Fulfill করবে? তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি। কারণ, কারও কাছ থেকে জন্ম নিলে জন্মদাতাকে কে জন্ম দিল এরকম প্রশ্ন আবার অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। একইভাবে তিনি কাউকে জন্মও দেননি। জন্ম দেওয়া বা জন্ম নেওয়া জীবের তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টাকে অবশ্যই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হতে পুরোপুরি মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে।

উপরে বর্ণিত গুণগুলো থাকতে হবে বলতে বোঝানো হচ্ছে এগুলোই একজন স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য। তিনি কোনোভাবেই সৃষ্টির মতো নন। একদম সহজে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা টেবিল বাতাস দেয় কি না, ঘূর্ণিঝড় তৈরি কীভাবে করে, এই প্রশ্ন যেমন অবান্তর এবং ভুল, ঠিক তেমনি একজন স্রষ্টার স্রষ্টা কে, তাঁকে কে পূর্ণ করে, তাঁর আগে তা হলে কী ছিল, সেই প্রশ্নগুলোও সব অবান্তর। কারণ, "টেবিলটা বাতাস কেমন দেয়?" এই প্রশ্নটাই যেমন অপ্রাসঙ্গিক, টেবিলের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, ঠিক একইভাবে স্রষ্টাকে কে তৈরি করল, তাঁর আগে কী ছিল, তিনি কী খেয়ে জীবনধারণ করেন, এই প্রশ্নগুলোও একইভাবে অবান্তর এবং ভুল।

স্রষ্টা কি এমন একটা পাথর বানাতে পারেন, যা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না? কিংবা তিনি কি নিজেকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দিতে পারেন? কিংবা তিনি কি খারাপ হতে পারেন? মিথ্যা বলতে পারেন? উত্তর হচ্ছে, না। কারণ, এর প্রতিটাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, স্ববিরোধী। তিনি এমন কিছু করতে পারবেন না যা স্ববিরোধী, যা তাঁর স্রষ্টা-

সত্তাকেই নষ্ট করে দিবে। আর তাঁর স্রষ্টা সত্তা নষ্ট হয়ে গেলে তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না।

অনেকে বলতে পারে, এই কাজগুলো করতে না পারলে তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা নন। আবারও স্ববিরোধী ভুল সিদ্ধান্ত। সহজ করার জন্যে বলি, কেউ যদি আপনাকে একটা টেনিস বল দেখিয়ে বলে এই বলটা কাঠের আলমারি তৈরি করতে পারে না, ফলে এটা টেনিস বলই নয়, এমনকি এই টেনিস বলটার অস্তিত্বও নেই। তা হলে আপনি হাহাহা করে হেসে ফেলবেন। কেন হাসবেন? তার যুক্তিতে ভুল কোথায়? ভুল এখানেই যে, সে টেনিস বলটার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বোকাটা টেনিস বলটার উপরে চাপিয়ে দিতে চাইছে, যা থাকলে এটা আর টেনিস বলই থাকবে না, হয়ে যাবে কাঠমিস্ত্রী! একইভাবে স্রষ্টারও এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না, বা তিনি এমন কিছু করতে পারেন না, যে বৈশিষ্ট্য থাকলে বা যা করলে তিনি আর স্রষ্টাই থাকবেন না।

বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে রাখা যাক :

১. স্রষ্টা এক। ফলে, পূজনীয় এবং উপাস্য হিসেবে শুধুমাত্র তাঁকেই মেনে নিতে হবে। কারণ, তিনি ব্যতীত আর সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। আর তাঁর প্রতিটা সৃষ্টিই তাঁর উপরে নির্ভরশীল। নির্ভরশীল কোনোকিছুই পূজনীয় এবং উপাস্য হতে পারে না। বরং এবং পূজনীয় শুধুমাত্র তিনিই, যিনি সবাইকে সৃষ্টির পর সবকিছু দেন, রক্ষা করেন কারও উপরে নির্ভরশীল না হয়েই।

২. তিনি সর্বশক্তিমান। কারণ, এত বিশাল গ্রহ, সুবিশাল নক্ষত্র, নিহারীকা থেকে শুরু করে কোষের জটিলতা পর্যন্ত যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে অন্যরকম শক্তির অধিকারী হতেই হবে যা কিনা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. অত্যন্ত বুদ্ধিমান যা কল্পনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

৪. স্বনির্ভর। কারও উপর নির্ভরশীল নন। সৃষ্ট নন। জন্ম নেননি। জন্ম দেননি। সৃষ্টি হওয়া, জন্ম নেওয়া নামক নির্ভরশীলতা থেকে তিনি মুক্ত।

৫. তিনি সৃষ্টি হতে আলাদা। তিনি সৃষ্টির মধ্যে থাকেন না। তিনি পরিচিত কোনোকিছুর মতোই নন।

মোটামুটিভাবে স্রষ্টাকে আমরা বুঝে ফেললাম। স্রষ্টা তো মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে, মানুষকে এই পৃথিবীর জীবনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠিয়েছেন শুনেছি। এবার সেগুলো যাচাই করে দেখি কোনটা স্রষ্টাকে